দৈনিক ইনকিলাব

বাংলা ভাষা ও ভারতীয়

আবদুল

একুশে অনুষ্ঠান নিয়ে দশ-বারো দিন একটানা অমানুষিক শ্রমের ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে গত সোমবার একুশে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যারাতে টেলিভিশন দেখছিলাম। বিটিভির একঘেয়েমি থেকে রেহাই পাবার জন্যই টিউন করেছিলাম ভারতীয় দূরদর্শনের 'ডিডি সেভেন' চ্যানেল। বাংলাদেশের একুশে ফেব্রুয়ারী 'বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস'-এর স্বীকৃতি পাওয়ায় এবার কলিকাতায় বেশ ঘটা করে একুশে ফেব্রুয়ারী 'মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হল। 'মাতৃভাষা উদযাপন কমিটি' গঠন করে আলোচনা সভা, সঙ্গীত, নৃত্য, 'শহীদ বেদী'তে ভাষা শহীদদের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ, সরকারের কাছে বাংলা ভাষাকে সরকারী অফিস-আদালতের ভাষা করার দাবী উত্থাপন প্রভৃতি অনেক কিছুই ছিল এসব কর্মসূচীর মধ্যে।

ভালই লাগছিল বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের 'বনেদী বাঙ্গালী'দের এই বিলম্বিত বোধোদয়ে। 'বিলম্বিত বোধোদয়' বললাম এজন্য যে, ভারত স্বাধীন হয়েছে সেই সাতচল্লিশ সালে। এরপর তিপ্পান্ন বছর পার হয়ে গেছে। এবার এতদিনে তাদের মনে পড়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বাংলাকে সরকারী ভাষা করা দরকার। আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সূতিকাগার বলে পরিচিত কলিকাতায় বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীদের এই বিলম্বিত আর্তি একটা কৌতূহলের ব্যাপারই বটে।

কৌতূহলের ব্যাপার বিশেষ করে এ কারণে যে, এই সেদিন পর্যন্ত বাঙ্গালী হিন্দুরা একমাত্র তাদেরকেই 'বাঙ্গালী' বিবেচনা করত। এমনকি, যে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, তিনিও তাঁর লেখায় কলিকাতায় 'বাঙ্গালী ও মুসলমানদের মধ্যে ফুটবল খেলার' কথা উল্লেখ করেছেন। বাঙ্গালী মুসলমানরাও যে বাঙ্গালী– এ কথা তাঁর মত সাহিত্যিকও বিবেচনায় আনতে পারেননি। এই মনোভাবের বশবর্তী হয়েই তারা উনিশ শতকের বাঙ্গালী হিন্দুর জাগরণকে 'বাঙ্গালীর জাগরণ' বলে চালিয়ে গেছেন। অথচ উনিশ শতকেও বাঙ্গালী মুসলমান জনসংখ্যার বিচারে বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রায় আধাআধি ছিল। আর বিশ শতকে এসে মুসলমানরাই বাঙ্গালীদের মেজরিটি জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, এক কথায় তাদের সামাজিক অস্তিত্বই যেন বাঙ্গালী হিন্দুরা দেখেও না দেখার ভান করেছে। তাই বলছিলাম, পশ্চিমবঙ্গের এই 'বনেদী' বাঙ্গালীদের বাংলা ভাষার সরকারী মর্যাদা সম্পর্কে বিলম্বিত বোধোদয় একটা কৌতূহলের ব্যাপারই বটে।

একুশে ফেব্রুয়ারীতে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে বায়ান্ন সালে ঢাকায় যারা রক্তদান করেছিল, তাদের সম্মানে কলিকাতায় নির্মিত হয়েছে 'শহীদ বেদী' (মিনার নয়)। সেখানে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন অনেকে। এছাড়া ছিল কবিতা পাঠ, নাচ, গান, আলোচনা এবং বাংলা ভাষার সরকারী মর্যাদার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানানো। মাতৃভাষা দিবস উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে কবি ও ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল দেখা করল রাজ্য সরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সাথে। তাদের দাবী কিঃ দাবী যে খুব বেশী একটা, তা নয়। সরকারের যেসব অফিস বা দফতরের সাথে আম-জনতার সম্পর্ক, সেসব দফতরের সাথে জনগণ যেন বাংলা ভাষায় যোগাযোগ করতে পারে। এই সুবাদেই জানা গেল, তাঁতী সমবায়ের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলায় আবেদনপত্র পাঠানোয় তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এই প্রত্যাখ্যানের সপক্ষে কর্তৃপক্ষের বক্তব্যটাও টিভিতে প্রচার করা হল। কর্তৃপক্ষের সে বক্তব্য জানালেন ভারপ্রাপ্ত এক বর্ষীয়ান মহিলা, যিনি নাকি রবীন্দ্রনাথেরও স্নেহধন্যা। তিনি বললেন, অফিসাদির কাজকর্মের সুবাদে এরা যদি ইংরেজী ভাষাটা রপ্ত করতে পারে, এতে অসুবিধার কি আছে!

হ্যাঁ, আসলে এতে 'অসুবিধার' কি আছে! অসুবিধা নেই বলেই তো স্বাধীনতার 'তিপ্পান্ন বছর পরেও 'বনেদী বাঙ্গালীদের রাজ্য ভারতীয় পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কাজকর্ম এখনও চলে ইংরেজী ভাষায়। 'ডিডি-সেভেন চ্যানেল' মারফতই জানা গেল, ভারতের বেশ কয়েকটি প্রদেশে সংশ্লিষ্ট প্রদেশবাসীর মাতৃভাষা সরকারী ভাষার মর্যাদা পেলেও পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা আজও সে মর্যাদা পায়নি। সুনীল বাবুরা সেই মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়েই অবতীর্ণ হয়েছেন। তারা অবশ্য আরো কতকগুলো ক্ষুদ্র দাবী-এর সাথে জুড়ে দাবীনামার বহর একটু দীর্ঘ করতে চেষ্টা করেছেন। এসব দাবীর মধ্যে রয়েছে কলিকাতা শহরের ইংরেজী নাম 'ক্যালকাটা' ও বাংলা নাম 'কলিকাতা' বদলিয়ে 'কলকাতা' করতে হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের ইংরেজী নাম 'ওয়েস্ট বেঙ্গল' না লিখে ইংরেজীতেও 'পশ্চিমবঙ্গ' লিখতে হবে। রাজ্যের সরকারী কার্যাদির ভাষা বাংলা করার ব্যাপারে সুনীল বাবু জানালেন, সরকার নীতিগতভাবে তাদের দাবী অনেক আগেই মেনে নিয়েছেন। তবে বাস্তবে তা কার্যকর হচ্ছে না। তাই এবার তারা একটা সময়সীমা বেঁধে দেয়ার দাবী জানান। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু জানালেন, এ ব্যাপারে সার্কুলার চলে গেছে যে, যে সকল বিভাগের কাজের সাথে জনগণের সম্পর্ক রয়েছে, যেমন পঞ্চায়েৎ, সেগুলোর কাজকর্ম যেন বাংলায় হয়, তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও জানালেন একই কথা। সুনীল বাবু জানালেন, আসছে বৈশাখ নাগাদ কাজগুলো সম্পন্ন হবে।

সুনীল বাবুদের 'ভাষা আন্দোলনের' ইতিবৃত্ত এখানেই শেষ। এবার মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সমবেত শিল্পী, সাহিত্যিক ও অন্যান্যদের কথা। কবিতা, গান ও নাচের ফাঁকে ফাঁকে চলছিল আলোচনা। আলোচনা তো নয়, সে এক মহা বিলাপের আসর– পাশের বাংলাদেশে অফিস-আদালত প্রায় সবকিছু চলে বাংলায়, যত অসুবিধা আমাদের বেলায় ইত্যাদি ইত্যাদি। পূর্ববঙ্গের 'বাঙ্গাল'দের তুলনায় বাংলাপ্রীতিতে 'বনেদী' বাঙ্গালীরা পিছিয়ে পড়েছে– এ খেদোক্তি শুনতে ভালই লাগছিল। বিলাপের এক ফাঁকেই কে একজন বললেন, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র যে ভাষায় লিখে গেছেন, সে বাংলা ভাষা কি কোন দিক দিয়ে ছোট হতে পারেঃ পারে না। অথচ আমরা সে ভাষাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারছি না।

একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম এই বক্তার বক্তৃতায়। তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেক কবি-সাহিত্যিকের নামই উচ্চারণ করলেন, যারা বাংলা সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করেছেন। কিন্তু ভুলেও উচ্চারণ করলেন না উনিশ শতকের সেই অমর গ্রন্থ 'বিষাদ সিন্ধু'-র রচয়িতা মীর মশাররফ বা বাংলা কাব্যে নতুন ধারার দুই স্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম ও জসীম উদ্দীনের নাম। এটাও বোধ হয় 'বনেদী' বাঙ্গালীদের এক 'বনেদী' বদভ্যাস। এই 'বনেদী' বদভ্যাসের কারণে এখনও সুনীল বাবুদের বিখ্যাত আনন্দবাজার পত্রিকায় উপমহাদেশের বিখ্যাত মুসলিম রাজনীতিবিদ সোহরাওয়ার্দীকে তারা লেখেন 'সুরাবর্দী'।

কলিকাতার মাতৃভাষা দিবস অনুষ্ঠানে বিলাপপর্বের পাশাপাশি মাঝে মাঝে আমাদের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনার নামে ইতিহাস বিকৃতির পালাও চালানো হয়। এসব ইতিহাস বিকৃতিও অবশ্য বনেদী বাঙ্গালীদে[র] পূর্ববঙ্গ তথা 'বাঙ্গাল'-বিদ্বেষী মনোভাবের এক ধরনে[র] বহিঃপ্রকাশ। একজন– আমাদের ভাষা আন্দোলনে[র] ইতিহাস 'শিক্ষা' দিতে গিয়ে বললেন, পাকিস্তানে[র] প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে বললেন পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা হবে উর্দু। ফলে চারদি[কে] বিক্ষোভ দেখা দিল এবং এভাবেই শুরু হল ভা[ষা] আন্দোলন। বক্তার এ বক্তব্যে দু'টি বড় ভুল ছি[ল]। প্রথমতঃ, জিন্নাহ সাহেব ঢাকায় আসেন ১৯৪৮ সালে[র] ১৯ মার্চ। অথচ এর ৮ দিন আগে ১১ মার্চ তারিখে সংঘটিত হয় ভাষা আন্দোলনের প্রথম সফল গ[ণ-] বিস্ফোরণ। ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে গণ-বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়, তাতে ঢাকার প্রশা[সন] কার্যতঃ অচল হয়ে পড়েছিল। সেক্রেটারিয়ে[টের] চারপাশের গেটে গেটে সেদিন পিকেটিং করেন ত[খন] আন্দোলনের তদানীন্তন নেতারা, যাদের মধ্যে ছি[লেন] অধ্যাপক আবুল কাসেম, অলি আহাদ, শেখ মু[জিবুর] রহমান, কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী, মো[হাম্মদ] তোয়াহা প্রমুখ অনেকে। পিকেটারদের উপর [পুলিশ] লাঠিচার্জ করলে অধ্যাপক আবুল কাসেমসহ অ[নেকে] আহত হন। গ্রেফতার হন জনাব অলি আহাদ, মুজিবুর রহমান, কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত

তারিখ FEB 24 2000
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম

দৈনিক ইনকিলাব ১৩

বাংলাদেশের প্রতি দরদের নমুনা

গফুর

প্রমুখ।

পুলিশের লাঠিচার্জ ও গ্রেফতারের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর সেদিন বিক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিক্ষোভ চলে পরদিন এবং তার পরের দু'দিনও। প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী অবস্থা বেগতিক দেখে ১৫ মার্চের মধ্যেই সাত-তাড়াতাড়ি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সকল দাবী-দাওয়া মেনে নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং আটক ভাষা সৈনিকদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন। জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতার পর ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয় বলে প্রচার করে এরা ১১ মার্চের সফল গণ-বিস্ফোরণের গৌরব থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে চান, যা ঘোরতর অন্যায়। শুধু তাই নয়, ভাষা আন্দোলন তো শুরু হয় আটচল্লিশেও নয়– ভাষা আন্দোলনের শুরু সাতচল্লিশের সেপ্টেম্বরে। সাতচল্লিশেই বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবীতে প্রথম সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। বহু মিটিং-মিছিল হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ও বিভিন্ন হলের মিলনায়তনে।

বক্তার আরেক ইচ্ছাকৃত ইতিহাস-বিকৃতি ছিল– জিন্নাহ পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা উর্দু হবে বলে ঘোষণা দেন, একথা বলা। প্রকৃতপক্ষে জিন্নাহ বলেছিলেন, পূর্ববঙ্গের সরকারী ভাষা কি হবে তা প্রদেশবাসীই ঠিক করবে, কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হবে শুধুমাত্র উর্দু। এই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তার সাথে আমাদের বিরোধ হয়েছিল। কারণ আমরা চেয়েছিলাম– পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হবে দু'টি– বাংলা ও উর্দু। তিনি এক রাষ্ট্রের দু'টি রাষ্ট্রভাষার বিরোধিতা করে বলেছিলেন, এতে রাষ্ট্রের অখণ্ডতা বিনষ্ট হবে। আমরা বলেছিলাম, লাহোর প্রস্তাবে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের কথা আছে। আমরা তো সে দাবী করছি না, দু'টি রাষ্ট্রভাষা চাইছি মাত্র। কারণ শুধুমাত্র উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে দেশের অধিকাংশ মানুষ রাতারাতি সরকারী কাজের অনুপযুক্ত হয়ে যাবে।

আসলে কলকাতাইয়া ঐ আলোচক হয়তো কল্পনাই করতে পারেননি, তারা ভারতে হিন্দীকে যেমন একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিয়েছেন, আমরাও বুঝি তেমনি উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিয়ে বাংলাকে পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা করার দাবীতে আন্দোলন করেছিলাম। তাদের এ বিভ্রান্তির মূল কারণ হয়তো তাদের নিজেদের চিন্তার দৈন্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে দেখব– বাঙ্গালী হিন্দুর মাথায় যেমন কখনও বাঙ্গালীর স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চিন্তা আসেনি, তেমনি আসেনি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দানের চিন্তা। এমনকি, রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বকবিও যেমন অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামোর বাইরে কখনও বাঙ্গালীর স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা ভাবেননি, তেমনি ভাবেননি বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা।

এই সুবাদেই উল্লেখ করতে হয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে মহাত্মা গান্ধী ভবিষ্যতের স্বাধীন (অবশ্যই অখণ্ড) ভারতে সরকারী ভাষা কি হতে পারে জানতে চেয়ে চিঠি দিলে রবীন্দ্রনাথ জবাবে কেবলমাত্র হিন্দী ভাষার কথা লিখেছিলেন। এর দু'বছর পর তিনি শান্তিনিকেতনে এ বিষয়ে একটি বড় ধরনের সুধী সমাবেশ ডাকেন। সে সমাবেশে ভাষাবিজ্ঞানী ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'ভারতের সাধারণ ভাষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সে প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাষা চিন্তার বিপরীতে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, শুধু হিন্দী নয়, বাংলা ও উর্দুরও ভারতের সরকারী ভাষা হবার যোগ্যতা আছে। স্বাধীনতার তিপ্পান্ন বছর পর আজও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেখানে বাংলাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দানের প্রশ্নে দ্বিধান্বিত, সেখানে মনে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ধনবাড়ীর জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সেই ১৯২১ সালেই বলেছিলেন, ভারতের সরকারী ভাষা নিয়ে উর্দু-হিন্দী যত ঝগড়া-বিবাদই হোক– বাংলার সরকারী ভাষা অবশ্যই বাংলা হতে হবে। বাংলাকে কেন্দ্র করে কোন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রচিন্তা যাদের কখনও ছিল না, তাদের মনে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার চিন্তার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং তা ওঠেওনি। এর প্রমাণ বহুবার পাওয়া গেছে। প্রথম পাওয়া যায় অবশ্য উনিশশ' সাতচল্লিশের স্বাধীনতার প্রাক্কালে। তখন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম শরৎ চন্দ্র বসুকে নিয়ে যে ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে সার্বভৌম বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা চালান, তার প্রতি মুসলিম লীগ হাই কমান্ড সমর্থন দান করলেও কংগ্রেসের গান্ধী-নেহরু-প্যাটেল তার প্রবল বিরোধিতা করেন। অন্যতম 'বনেদী' বাঙ্গালী নেতা শ্যামাপ্রসাদ তো পষ্টাপষ্টিই বলেন, ভারত ভাগ না হলেও বাংলা ভাগ হতেই হবে। এরপর একাত্তরে দেবদুলালের কণ্ঠে 'এপার বাংলা-ওপার বাংলা'র ঐক্যতানের কথা শুনে আমরা ভেবেছিলাম, এতদিন ধরে হিন্দী সাম্রাজ্যের ঘানি টানার পর এবার বোধহয় তাদের বোধোদয় হয়েছে। এবার আমরা যেমন পিন্ডি ছেড়েছি, তারাও হয়ত তেমনি দিল্লীর শৃঙ্খল ছিঁড়ে বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গড়তে এগিয়ে আসবে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! মওলানা ভাসানীর এ ধরনের এক আহ্বানের প্রেক্ষিতে তারা জানালেন, তারা বাংলা ভাষাভাষী হতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় নাগরিক হিসেবে 'ভারতীয়' অভিধায় অভিহিত হতেই তারা পছন্দ করেন। এরপর বোঝা গেল বাংলার মাটিতে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের গড়া প্রতিষ্ঠানের নাম কেন 'বিশ্ব বাঙ্গালী' নয়, 'বিশ্বভারতী'। যারা ভারতকেই তাদের স্বপ্নভূমি মনে করে, বাংলাকেন্দ্রিক রাষ্ট্রচিন্তা যাদের মাথায় প্রবেশই করে না, তাদের পক্ষে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় তথা সরকারী মর্যাদার চিন্তা করা খুবই কঠিন নয় কি?

এরপরও আমাদের দেশের ভারতপ্রেমে গদগদ কিছু লোক বলতে চান, ভারত বাংলাদেশকে 'বন্ধুরাষ্ট্র' মনে করে! প্রমাণ? প্রমাণ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সাহায্য দান। কিন্তু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সাহায্যের নমুনা তো মেলে মুজিবনগর সরকারকে হাতের মুঠির মধ্যে পেয়ে তাদের এমন চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করা– যাতে করে বাংলাদেশ ভুটানের মত ভারতের আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভারতের একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশ নীতিতেও প্রমাণিত হয়েছে ভারত বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নয়, তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসেবেই দেখতে চায়। ভারত এই যে পৃথিবীর একমাত্র বাঙ্গালী-শাসিত রাষ্ট্রটিকে পঙ্গু তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়, ভারতের এ নষ্টচিন্তায় পশ্চিমবঙ্গের বনেদী বাঙ্গালীদেরও পুলকিত সায় রয়েছে। সুতরাং কলিকাতার বাবু-বাঙ্গালীরা যখন একুশে ফেব্রুয়ারীতে 'বাংলা গেল, বাঙ্গালী গেল' বলে বিলাপ আর আহাজারি করেন, তখন তাদের করুণা করা ছাড়া আমাদের আর কিইবা করার থাকে?

কিছুই আমাদের করার নেই। তবুও কিছু বলার অবশ্যই আছে। প্রশ্নটা আলতোভাবে প্রথমে তুলেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান বাহাত্তর সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কলিকাতা সফর করতে গিয়ে। তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা "সাত কোটি বাঙ্গালীর হে মুগ্ধ জননী, রেখেছো বাঙ্গালী করে, মানুষ করোনি" উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, "কবিগুরু, আপনার বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করে আমরা মানুষ হয়েছি, বাঙ্গালীদের একটা স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করেছি।"

কিন্তু 'বাঙ্গালী' থেকে মানুষে পরিণত হওয়া এ বাঙ্গালী কারা? ঐ ভাষণের আটাশ বছর পর গত ২০ ফেব্রুয়ারী তমদ্দুন মজলিসের আয়োজিত একুশে অনুষ্ঠানে বেগম খালেদা জিয়া তার জবাব দিয়েছেন– "একুশে সংঘটিত হয় পূর্ববঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গে নয়। উভয় বঙ্গের মূল ভাষাই বাংলা। তাহলে দু' জনগোষ্ঠীর পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য তাদের ধর্মবিশ্বাসে। এপার বাংলার মানুষ এক আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথানত করতে জানে না। তাই তাদের পক্ষেই বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবীতে রক্ত দান সম্ভব হয়েছে। সম্ভব হয়েছে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।"

ওপার বাংলার দাদা বাবুরা বাংলার জন্য রক্ত দিতে না পারলেও মুসলিম-বিদ্বেষ আর হিংসাযুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে যে পুরাপুরি সফল হয়েছেন, তার প্রমাণও রয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায়। ১৯০৫ সালে তাদের পূর্ববঙ্গের জমিদারী ও কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য বাঙ্গালী ঐক্যের দরদে তারা প্রচুর আহাজারি করলেও বাংলার অধিকাংশ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ভূখণ্ডের মধ্যস্থল ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-চেষ্টার বিরুদ্ধে তাদের মোক্ষম 'যুক্তি' ছিল, পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ লোক মুসলমান চাষী, তাই তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই। ১৯০৫ সালে বাঙ্গালী ঐক্যের জন্য যারা প্রচুর কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করে, তাদের উত্তরসুরীদের মুখ থেকেই সাতচল্লিশে নির্গত হয়েছিল মোক্ষম দাবী– 'ভারত ভাগ না হলেও বাংলাকে ভাগ করতেই হবে'।